The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 9, No. 17, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের বানানরীতি

তারিক মনজুর*

Abstract: Sri Krishna Kirtana of Boru Chandidas is considered to be the most significant work after Charyapada in the history of Bengali literature. This verse is thought to be written in the pre-Chaitanya era of the later half of 14th century. In this article, the spelling rules of Sri Krishna Kirtana have been studied thoroughly without comparing it with any other manuscripts. This study itself is surprising that Sri Krishna Kirtana, retrieved by Basanta Ranjan Roy, has the eighteenth century effect on the spelling rules of some words. By the study of spelling rules and script structures, it seems that the original manuscript writing date may be earlier of the middle age but the writing time of that retrieved manuscript is in the eighteenth century.

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন[১] কাব্য, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা লিপিতে লেখা সম্ভবত প্রাচীনতম পুথি (রামেন্দ্রসুন্দর, ১৩৬৮; মুখবন্ধ ৩)। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে) বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়া জেলা থেকে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় লেখা এই পুথিটি আবিষ্কার করেন। এর সাত বছর পর ১৩২৩ বঙ্গাব্দে আবিষ্কারকের নিজের সম্পাদনায় কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি প্রকাশিত হয়। (হাই ও পাশা, ১৪০২ : ৫)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের যে গ্রন্থ বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করেন, তার একটিমাত্র পুথি পাওয়া গেছে। এই পুথিটিও সম্পূর্ণ নয়। গ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে পুষ্পিকা নেই; কেবল গান বা কবিতার শেষে ভণিতায় কবির নাম পাওয়া যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল' প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এতদ্ব্যতীত পুথির অথবা গ্রন্থকারের কাল নির্ণয় করিবার কোনও উপদান এই নবাবিষ্কৃত গ্রন্থে নাই। মধ্য এসিয়ায় আবিষ্কৃত বহু তালপত্রে লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের কাল নির্ণয়ের জন্য প্রত্নলিপিতত্ত্ব (paloeography) ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পুথির কাল নির্ণয়ের জন্য প্রত্নলিপিতত্ত্ব ব্যবহৃত হয় নাই' (রাখালদাস, ১৩৬৮ :

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১)। এরপর রাখালদাস (১৩৬৮) মন্তব্য করেছেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়* বাংলা ভাষায় লেখা এবং রচনাকাল হিসেবে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* চেয়েও প্রাচীন; কিন্তু *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* চেয়ে পুরনো বাংলা পুথি আর কোনোটি নয়।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের বানানরীতি পর্যবেক্ষণ করা – অপরাপর কোনো পুথির বানানরীতির সঙ্গে এর তুলনা করার চেষ্টা হবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলা বানানের রীতি ও পরিবর্তনের ধারা বোঝার জন্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* পূর্ববর্তী কোনো লিখিত গ্রন্থ নেই। এমনকি এর পরবর্তী পুথিগুলোর মধ্যে সীমিত সংখ্যকই সম্পাদিত হয়ে বের হয়েছে – তাও অধিকাংশ সম্পাদিত গ্রন্থে মূল পুথির প্রকৃত বানানকে পরিবর্তন করে আধুনিক বানানরীতিতে লেখা হয়েছে।[২] ফলে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বানানরীতি নিয়ে কাজ করার জন্য এটি একটি বড় অন্তরায়। তবে, আশার কথা, এদিক থেকে ব্যতিক্রম *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*; এর সম্পাদক 'ভাষা-বিজ্ঞানের অনুশীলন-সৌকর্যার্থে' *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* পুথির বানান 'যথাবৎ' রেখে দিয়েছেন। (বসন্তরঞ্জন, ১৩৬৮; ভূমিকা ১৫)

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* রচিত হয়ে থাকবে বলে অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক একমত হয়েছেন (নীলরতন, ২০০৪ : ১২)। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* লিপি পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন, ১৩৮৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবত খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এটি লিখিত হয়েছিল (রাখালদাস, ১৩৬৮ : ৬)। সুকুমার সেন অবশ্য মনে করেন, *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। তিনি এর ভাষার প্রাচীনত্ব স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মধ্যকালীন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন রূপটি যতটা অবিকৃত আছে এতটা আর কোন পুরানো গ্রন্থে পাই না' (হাই ও পাশা, ১৪০২ : ১১)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* ভাষাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং এটিকে *চর্যাপদের* পরে প্রথম মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেছেন (Chatterjee, 2011: 127)। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে* ১৩৪০ থেকে ১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বলে মনে করেন। (হাই ও পাশা, ১৪০২ : ১৪)

নানাভাবে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* কাল নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে। পুথির মধ্যে যে চিরকুট পাওয়া গিয়েছিল, তাতে সন ১০৮৯ দেখা যাচ্ছে। এই সন বঙ্গাব্দ হওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং সেই হিসেবে ১৬৮২ খ্রিষ্টাব্দে পুথিটি বন-বিষ্ণুপুরের রাজগ্রন্থাগারে ছিল। তার আগেই কোনো এক সময়ে এটি লিখিত হয়েছিল। (হাই ও পাশা, ১৪০২ : ১১)

২. শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপি

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* গ্রন্থের যে অংশটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে এক বা একাধিক ব্যক্তির তিন ধরনের হস্তাক্ষর দেখা যায় – (১) প্রাচীন হস্তাক্ষর,

(২) প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি, (৩) অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* গ্রন্থে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়েছে, তা বর্তমান অথবা খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণমালা অপেক্ষা প্রাচীন। অনেক অক্ষরের আকার সেই অক্ষরের বর্তমান আকারের ন্যায়, কিন্তু অনেকগুলো অক্ষরে বর্তমান আকার বা আকারগত সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না (রাখালদাস, ১৩৬৮ : ১)। এরপর রাখালদাস (১৩৬৮) এর একটি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা এবং নীলরতন সেনের (২০০৪) *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* মূল পুথির ফটোমুদ্রণ সংস্করণ অনুসরণ করে একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করা যেতে পারে :

বর্ণ	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপি	আকৃতি
অ	অ	বর্তমান আকার। সামান্য পরিবর্তিত।
আ	আ	বর্তমান আকার। সামান্য পরিবর্তিত।
ই	ই	বর্তমান আকার।
ঈ	ঈ	বর্তমান আকার।
উ	উ	আকার অপেক্ষাকৃত প্রাচীন।
ঊ	ঊ	আকার অপেক্ষাকৃত প্রাচীন।
এ	এ	বর্তমান আকার।
ও	ও	বর্তমান আকার।

ক	ক ক	দুই ধরনের আকার। বর্তমান অক্ষরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।
খ	খ	আকারে প্রাচীন।
গ	গ	বর্তমান আকারের।
ঘ	ঘ	আকারে প্রাচীন।
ঙ		কেবল যুক্তাক্ষরে দেখা যায়।
চ	চ	বর্তমান আকারের। কদাচিৎ প্রাচীন।
ছ	ছ	কোনো কোনো স্থানে প্রাচীন, কোনো কোনো স্থানে বর্তমান আকারের।

জ		দুই ধরনের 'জ'। দুই প্রকারই প্রাচীন।
ঝ		দুই ধরনের ঝ – বর্তমান আকার ও প্রাচীন আকার।
ঞ		'ঙ' এর মতো 'ঞ' স্বতন্ত্র দেখা যায় না।
ট		তিন ধরনের ট – প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান আকার।
ঠ		বর্তমান আকারের।
ড		বর্তমান আকারের।
ঢ		প্রাচীন আকারের।
ণ		দুই ধরনের।
ত		বর্তমানে আকারের।
থ		প্রাচীন আকারের।
দ		দুই ধরনের দ – প্রাচীন ও আধুনিক।
ধ		প্রায় বর্তমান আকারের।
ন		বর্তমান আকারের।
প		তিন ধরনের – একটি ধরন আধুনিক, অন্য দুটি পরিবর্তন-যুগের।
ফ		প্রাচীন আকার।
ব		আধুনিক আকার।
ভ		প্রাচীন আকার।
ম		আধুনিক আকার।
য		প্রাচীন আকার।
র		কোনো কোনো স্থানে 'র'-এর মধ্যখানে একটি সরলরেখা।
ল		প্রাচীন আকার।
শ		আধুনিক আকার।
ষ		আধুনিক আকার।
স		আধুনিক আকার।
হ		আধুনিক আকার।
়		আধুনিক আকার।

দেখা যায়, স্বরবর্ণের মধ্যে উ, ঊ, ঋ, ৯ – এই চারটি প্রাচীন আকারের। ক-বর্গের মধ্যে 'খ' ও 'ঘ' প্রাচীন আকারের। চ-বর্গের 'চ', 'ছ', 'জ' কখনও কখনও প্রাচীন আকারের। ট-বর্গের 'ট' ও 'ণ'-এর প্রাচীন রূপ দেখা যায়। ত-বর্গের কেবল 'থ' প্রাচীন আকারের। প-বর্গের মধ্যে প্রাচীন আকারের 'ফ' ও 'ভ' দেখা যায়। অন্তস্থ বর্ণের মধ্যে 'য' ও 'ল' প্রাচীন আকারের এবং উষ্মবর্ণের সবগুলোই আধুনিক আকারের।

মূল পুথিতে আরও দেখা যায়, কার-চিহ্নগুলো প্রায় আধুনিক রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। যুক্তবর্ণ যথেষ্ট পরিমাণে এসেছে। কার-চিহ্নের এবং কয়েকটি যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের নমুনা দেখা যাক (নীলরতন, ২০০৪ : ১৭) :

কার-চিহ্ন	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে
আ-কার (া)	
ই-কার (ি)	
ঈ-কার (ী)	
উ-কার (ু)	
ঊ-কার (ূ)	
ঋ-কার (ৃ)	
এ-কার (ে)	
ঐ-কার (ৈ)	
ও-কার (ো)	
ঔ-কার (ৌ)	

স্ক	ঙ্গ	দ্দ	ঞ্জ	ক্র	হ্ন

৩. মধ্যযুগের বানান-সমস্যা

মধ্যযুগের কোনো কোনো পুথিতে, তা ছোট হোক কি বড়, দু-তিন হাতের স্বাক্ষর মেলে। একটি পুথি একাধিক লিপিকর লিখলে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও মানসবৈশিষ্ট্য অনুসারে তাতে বানানের ভিন্নতা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে*র পুথিতে একাধিক হস্তাক্ষর একেবারে স্পষ্ট। যদিও একথা মেনে নেয়া যায়, একজন লিপিকর

একাধিক রীতিতে পুথি লিখে থাকতে পারেন। কিন্তু পুথির বানান থেকে অন্তত দুই লিপিকরের হস্তাক্ষরের প্রমাণ মেলে। যেমন, *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* এক লিপিতে আছে 'ভা-ঠি-আ-লী'; আর এক প্রকার লিপিতে লেখা 'ভা-য়ি-ঠা-লী' (মুজাম্মিল, ২০০২ : ৫৫)। খন্দকার মুজাম্মিল হক সন্দেহ করছেন, দুজন লিপিকরের হাতে পড়ে শব্দটির বানান ও উচ্চারণ-বিভ্রাট ঘটেছে।

পুথিতে আঞ্চলিক ভাষারীতির প্রভাবেও বানান-বৈষম্য ঘটে থাকতে পারে। এই বৈষম্য লেখক ও লিপিকর – উভয় সূত্রেই আসতে পারে। যেমন : *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* পুথির দানখণ্ডের একটি পদে মূল পাঠে পাওয়া যায় 'কাজন' (কাজল) ও 'নাঞ্ছণ' (লাঞ্ছন) শব্দ দুটি। এ শব্দগুলো আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। বাঙালির উচ্চরণে 'ল' অঞ্চলবিশেষে 'ন' হয়ে যায়। এই পুথিতেই আবার বাণখণ্ডের তৃতীয় পদে 'কাজল' শব্দ পাওয়া যায়। (মুজাম্মিল, ২০০২ : ৫৬)

খন্দকার মুজাম্মিল হক (২০০২) মধ্যযুগের হস্তলিখিত পুথির বানানবৈচিত্র্যের কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। একাধিক লিপিকরের যৌথ লিখনের ফলে যেমন বানান-পার্থক্য ঘটতে পারে, তেমনি আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবেও বানান-পার্থক্য ঘটেছে। এছাড়া তিনি বানানবৈচিত্র্যের অন্যান্য কারণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন – লিপিকরের শারীরিক ও শিক্ষাগত অসামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা, কথ্যরীতির প্রভাব এবং শ্রুতিলিখন। মধ্যযুগের বিশেষ লিপিরীতির ফলে শব্দের রূপ ও বানানের নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন[৩] :

(১) দ্বিত্ব নির্দেশক ব-ফলা : 'পল্লব' লিখতে 'পল্বব'

(২) উ-কার নির্দেশক ব-ফলা : 'মুলুক' লিখতে 'মুল্বক'

(৩) য-ফলার সাধারণ প্রয়োগ : 'দৈবজ্ঞ' লিখতে 'দৈবগ্য'

(৪) বিসর্গের (ঃ) বিশেষ প্রয়োগ : 'কুক্কুর' লিখতে 'কুঃকুর'

(৫) ই/ঈ-কারের সুবিধামাফিক প্রয়োগ : 'দেখি' লিখতে 'দেখী'

(৬) কৌণিক চিহ্নের প্রয়োগ : 'তিক্ষ্ণ' লিখতে 'তিখ'

(৭) বিচিত্র কারণে রেফ (র্)-এর ব্যবহার : 'সক্কল' লিখতে 'সর্কল'

মধ্যযুগের পুথির একটা বড় সমস্যা ছিল সুনির্দিষ্ট বানানরীতির অভাব। পুথি ও লিপিকর ভেদে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বানান লক্ষ করা যায়।

৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বানানরীতি

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির বানানে লক্ষণীয় কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। এগুলোর বিবরণ এই অংশে দেওয়া হবে এবং পরবর্তী অংশে তার সম্ভাব্য কারণ বিশ্লেষিত হবে।

৪.১ *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* পুথির পাঠে চন্দ্রবিন্দুর আধিক্য লক্ষ করা যায়। যেমন :

দেবেঁ (দেবে), চিন্তিআঁ (চিন্তিয়া), লআঁ (লয়া), স্তুতীএঁ (স্তুতিয়া), হাসিআঁ (হাসিয়া), পাআঁ (পাইয়া), উপেখিআঁ (উপক্ষো করে), খোণেকে (ক্ষণেক), দিআঁ (দিয়া), উঠিআঁ (উঠিয়া), দেখিআঁ (দেখিয়া), সুখেঁ (সুখে), নাহিঁ (নাহি), এবেঁ (এবে), তোঁ (তো), কহিলোঁ (কহিলো), মোঁই (মুই), হতেঁ (হতে), আসিআঁ (আসিয়া), তবেঁ (তবে), দৈবকীঞ (দৈবকী), উপদেশেঁ (উপদেশে), একেঁ একেঁ (একে একে), সুঁঅরী (স্মরণ করে), করিআঁ (করিআ), গিআঁ (গিয়া), কাহ্নাঞিঁ (কাহ্ন), প্রসাদেঁ (প্রাসাদে), তবেঁ (তবে), নিন্দভোলেঁ (নিন্দভোলে), হআঁ (হয়া), দিআঁ (দিয়া), আছাড়িআঁ (আছাড়িয়া), থাকিআঁ (থাকিয়া), হেনমতেঁ (হেনমতে), চন্দনতিলকেঁ (চন্দনতিলকে), বোলেঁ (বোলে), পোঁআর (পোআর < প্রবাল), গিআঁ (গিয়া), কোঁঅলী (কোমলী < কোমলাঙ্গী), দৈবেঁ (দৈবে), গিআঁ (গিয়া)।

ওপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ করা যায়, ক্রিয়াপদের শেষে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ-আধিক্য রয়েছে। অন্যদিকে চন্দ্রবিন্দুবিহীন ক্রিয়াপদও পাওয়া যায়। যেমন :

গাইল, পাতিল, হএ (হয়), বুয়িল/বুলিল (বলিল), তুষিল, কইলে, শুণী, দিল, হৈবে (হইবে), গেলা, রহিলা, আয়িলা (আইলা), পাকিল, নাচএ (নাচে), হাসে, ধরে, রহে, বোলে, মেলে, কাঢ়ে (কাড়ে), কর, হৈল (হইল), চিন্তির (চিন্তিল), নিয়োজিল, কহিল, ধরিব, মারিব, হৈব (হইব), দিব, হয়িব (হইব), শুণী (শুনি < শুনে), মাইল/মায়িল (মারিল), গেল, রহিলা, রহিল, দিল, ধরল, গেল, ধরী (ধরি), লভিল, জাণিল (জানিল), উপজিল (< উৎপন্ন হল), চলিলা, করি (ক'রে), দেখি, গেল, আণিল (আনিল), চিআইল, জাণায়িল (জানাইল), বুলিলে (বলিল), কৈল (করিল), সংহরিল, পাঠায়িল/পাঠাইল, ভাঙ্গীল, বাঢ়িলা, করি, করে, ধরে, রাখে, বুলিল (বলিল), রাঢ়ে (বাড়ে), পুরিল, দেহ (দেও), চাহি, লৈল (নিল)।

চন্দ্রবিন্দুর এমন পাঠও দেখা যায়, যা বর্তমান বানানরীতিতে শুদ্ধ। যেমন :

বাঁশী, ঝাঁট, চাঁদ।

৪.২ *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* পুথির কিছু শব্দে আদি 'অ' স্থানে 'আ' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

আন্তর (অন্তর), আঞ্চল (অঞ্চল), আবতার (অবতার), আনুগতী (অনুগতী), আনুমতী (অনুমতি), আনাথি (অনাথি), আতি (অতি), আহোনিশি (অহনিশি), আসুর (অসুর), আনুরূপ (অনুরূপ), আনন্ত (অনন্ত), আধিক (অধিক), আলস (অলস), আতিশয় (অতিশয়), আনেক (অনেক), আচেতন (অচেতন), আপমান (অপমান), আশেষ (অশেষ), আধর (অধর)।

তবে অ-এর যথাযথ প্রয়োগও দেখা যায় :

অতি, অবসরে, অতিশয়, অলঙ্কার, অদভুদ (অদ্ভুত), অনুপামা (অনুপমা), অভিমান, অপমান, অন্তর।

৪.৩ দন্ত্য স-এর যথাযথ (বা বর্তমান) রূপে ব্যবহার :

সভাপতি, সব, সভাসদ, বাসলীগণে, কংস, সৃষ্টি, সঙ্কেই (সবাই), সাগর, স্তুতী (স্তুতি), আসুর (অসুর), বাসে, সুমতি, চণ্ডীদাস, হাস (হাসি), সচকীত (সচকিত), আসিআঁ (আসয়িা), সত্বর, বাসুদেব, সকল, সেহি (সেই), অবসর, সুঁঅরী (স্মরণ করে), মাস, প্রসাদেঁ (প্রসাদে), প্রসব, সংহরিল (সংহার করল), সমর, সুরেখ, সুপুট, নাসা, সদৃশ, চন্দ্রসম, সজল, বসন, সম্ভোগ, রতিরস, কুসুম, নপুংসক, পিসী (পিসি)।

তালব্য শ-এর যথাযথ (বা বর্তমান) রূপে ব্যবহার :

শরণ, আকাশ, বিনাশ, শুণী (শুনে), কেশ, শরীর, বেশ, নাশ, উপদেশ, অতিশয়, শঙ্খ, শারঙ্গ, দশ, শির, নিশি, শুভক্ষণে, যশোদা, শিশু, শিলা, সুবেশ, শোভিত, সদৃশ, শোভে, বাঁশী (বাঁশি), পাশে, শেত (শ্বেত)।

মূর্ধন্য ষ-এর যথাযথ (বা বর্তমান রূপে) ব্যবহার :

মানুষ, সুপুরুষ, বরিষে (বর্ষে), আষ্টমী (অষ্টমী), বিষম, ওষ্ঠ, শিরীষ (শিরিষ)।

তালব্য শ স্থানে দন্ত্য স-এর ব্যবহার :

বত্তিস (বত্রিশ)।

মূর্ধন্য ষ স্থানে দন্ত্য স-এর ব্যবহার :

ঈসত (ঈষৎ)।

দন্ত্য স এবং তালব্য শ – উভয় অক্ষরেরই ব্যবহার :

কংস/কংশ, আকাশ/আকাস, নাসা/নাশা।

৪.৪ দন্ত্য ন-এর যথাযথ ব্যবহার :

জন, বিনাশ, নানা, হেন, বনমালী, নাম, মুনী (মুনি), নারদ, বামন, নাচএ (নাচে), বদন, কানে, আনচান, ঘন ঘন, যেন, বন্দী, নাহিঁ (নাহি), নাশ, মনে, জীবন, মন্ত্রি, মানুষ, নিয়োজিল, থানে, দিনে দিনে, নিশি, নিন্দে, না, যমুনা, নান্দ (নন্দ), পূতনাক (পূতনাকে), তনপান (স্তনপান), আর্জুন (অর্জুন), আনন্তরে (অনন্তকে), নীল, চন্দন, উন্নত, নয়ন, জানুত (জানুতে), নির্ম্মিত (নির্মিত), নখ, দেহকান্তী (দেহকান্তি), নিতি নিতি, বৃন্দাবন, ভুবন, মোহিনী, কনক, তনু, যেহেন (যেন), নপুংসক, যৌবন, চুনরেখ, নাসা, দন্ত, নাভি, গমন।

মূর্ধন্য ণ-এর যথাযথ ব্যবহার :

গণ, শরণ, মরণ, ততিখনে (ততক্ষণে), খনে খনে (ক্ষণে ক্ষণে), কারণে, খণেকেঁ (ক্ষণে), নারায়ণ, রক্ষণে, রোহিণী, আবেক্ষণ, চণ্ডীদাস, শুভক্ষণে, ধরণীত (ধরণীতে), কণ্ন (কর্ণ), বরুণ, ক্ষীণ, মণি, রাণী (রানি), বাণী।

দন্ত্য ন স্থানে মূর্ধন্য ণ-এর ব্যবহার :

কমণ (কেমন), শুনী (শুনে), বিণি (বিনা), কোণ (কোন), জাণ (জান), আপণে (আপনি), তখণে (তখন), জাণিল (জানিল), কণ্যা (কন্যা), আণিল (আনিল), জাণায়িল (জানাইল), কামাণ (কামান), মাণিক (মানিক), ণীসারে (নিঃসরণ করে), জাণিবোঁ (জানিব), কমণ (কেমন)।

মূর্ধণ্য ণ স্থানে দন্ত্য ন-এর ব্যবহার :

নারায়ন (নারায়ণ), সংপুন (সম্পূর্ণ), পুনে (পুণ্যে)।

৪.৫ হ্রস্ব ই-এর যথাযথ ব্যবহার :

সভাপতি, মেলি (মিলে), পাতিল, সৃষ্টি, বিনাশ, ইহার, চিন্তিআঁ (চিন্তিয়া), বুয়িল (বলিল), তুষিল, হরি, ভিতরে, হাসিআঁ (হাসিয়া), দুই, দিল, গাইল, সুমতি, আয়িলা (আইলা > আইল), পাকিল, বিণি (বিনা), দেখি, দিআঁ (দিয়া), ভূমিত (ভূমিতে), উঠিআঁ (উঠিয়া), মিছাই, নাহিঁ (নাহি), অতি, কহিলোঁ (কইল), মন্ত্রি, সবই, মারিব, মাইল (মারিল), রহিলা, দিনে দিনে, শির, বিজয়, নিশি, বারি, বরিষে, তিথি, কাহ্নাঞিঁ, জাণিল (জানিল), নিন্দে, চলিলা, করি, শিলা, আদি, পাঠাইল, বিষম, কুটিল, তিলক, শোভিত, বিশাল, কেলি, মাণিক, সহিত, নিতি নিতি, পুরিল, বড়ায়ি, ভাঙ্গিল, আখি (আঁখি), বিকট, নাভি।

দীর্ঘ ঈ-এর যথাযথ ব্যবহার :

চণ্ডীদাস, বাসলী, লীলাএ (লীলায়), ঈসত (ঈষৎ), দৈবকী, বনমালী, শরীর, গুণী, জীবন, মহাবীর, আষ্টমী (অষ্টমী), পহরী (প্রহরী), নীল, দীর্ঘ, ক্ষীণ, শরীর, পীত, পৃথিবী, মোহিনী, লীলা, রাণী (রানি), গুণী, হীন, খীন (ক্ষীণ), বাণী, ধরণী, রূপসী।

হ্রস্ব ই স্থানে দীর্ঘ ঈ-এর ব্যবহার :

স্তুতী (স্তুতি), গুণী (গুনি > গুনে), মুনী (মুনি), দাঢ়ী (দাড়ি), গতী (গতি), মতী (মতি), জীহের (জিভের), বন্দী (বন্দি), হীত (হিত), হরী (হরি), ধরী (ধরি > ধরে), ভাঙ্গীল (ভাঙিল), দুঈ (দুই), বত্তীশ (বত্রিশ), বাঁশী (বাঁশি), তীন (তিন), পুতলী (পুতলি), বুঢ়ী, (বুড়ি), পিসী (পিসি), কাঠী (কাঠি)।

৪.৬ হ্রস্ব উ-এর যথাযথ ব্যবহার :

বড়ু, দুই, সুমতি, গুণী (গুনি > গুনে), মুণী (মুনি), উঠিআঁ (উঠিয়া), সুখেঁ (সুখে), মুখে, উঠে, মানুষ, বসুদেব, দুঠ্ঠ (দুষ্ট), উপদেশ, দুয়ি (দুয়ে), কংশাসুর (কংসাসুর), সুপুরুষ, গোকুল, যমুনা, কুটিল, পুছ (পুচ্ছ), সুবেশ, লঘু, ভুজ, জানু, ভুবন, কুসুম, পুতলী, পুরিল, নপুংসক, গুণী, পদুমা, বুঢ়ী (বুড়ি), চুন, বাটুল, কুচ, পুণ্যেঁ (পুণ্যে)।

দীর্ঘ ঊ-এর যথাযথ ব্যবহার :

ভূমিত (ভূমিতে), পূর্ব্বে (পূর্বে), রূপ, ময়ূর, ভ্রূহি (ভ্রূ), নাভিমূল।

৪.৭ বর্গীয় জ-এর যথাযথ ব্যবহার :

জিণী (জিনি < জয় করে), জাতী/জাতি, তেজ, বাজাওঁ (বাজাও), লাজ, জাণী (জানি), লজ্জা, রাজহংস, রাজা, জননী, জলদসম, বিজুলি, জন, আজি, রাজপদ, জলে, জগন্নাথ, নিলজ (নিলাজ), আর্জ্জুন (অর্জুন)।

অন্তস্থ য-এর যথাযথ ব্যবহার :

যাব, যেন, যম, যত, যবেঁ, যাইবি, যাইউ, যেহ্ন, (যেন), যাবত, যোনি, যাবোঁ, যাহা, যমজ, যশোদা, যতনে, যায়, যা, যেমনে, যৌবন, যোগ, যথাঁ, যাহার, যুগতী, যমুনার, যাও।

বর্গীয় জ স্থানে অন্তস্থ য-এর ব্যবহার :

যানাইলে, যানে (জানে), যুতী (জ্যোতি), যরম (জন্ম), যানি (জানি)।

অন্তস্থ য স্থানে বর্গীয় জ-এর ব্যবহার :

জাএ, জাই, জত, জাইব, জায়, জাওঁ, জাহা, জাইবেঁ, জাইবি, জাইতেঁ, জখন, জাকে, জাণিবোঁ, জাইবার ও জুড়িআঁ।

৪.৮ ক্ষ-এর যথাযথ ব্যবহার :

ক্ষেমা (ক্ষমা), ক্ষণে, ক্ষীর, ক্ষত্রিয়, লক্ষ।

ক্ষ স্থানে খ-এর ব্যবহার :

খণে, খিধা, খুরের, খেতি, খণেক, খয়ে, সাখী (সাক্ষী), উপেখিল, (উপেক্ষা করল)।

সংস্কৃত থেকে রূপান্তরিত শব্দে খ-এর ব্যবহার :

লাখ (< লক্ষ), চখু (< চক্ষু), আখী (< অক্ষি), সাখী (< সাক্ষী), ততিখনে (ততক্ষণে)।

৪.৯ ক্রিয়ার শেষে 'আঁ'-এর ব্যবহার :

চিন্তিআঁ, লআঁ, হাসিআঁ, শুণিআঁ, লইবোঁ, হয়িআঁ, খাওঁ, দলিলোঁ।

৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বানানসূত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত শব্দের বানানে যেসব সাধারণ প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা দেখানো হয়েছে (দ্র. ৪.১ থেকে ৪.৯)। এখন এর বানানসূত্র বা এরূপ বানান ব্যবহারের সম্ভাব্য কারণ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা যেতে পারে। ৪.১-এর সমান্তরালে ৫.১, ৪.২-এর জন্য ৫.২ – এভাবে মিলিয়ে দেখতে হবে।

৫.১ *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে* চন্দ্রবিন্দুর যে ছড়াছড়ি রয়েছে, তাতে সম্ভবত আঞ্চলিকতার প্রভাব কার্যকর হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বসন্তরঞ্জন রায় প্রাকৃত ভাষার প্রভাবের কথা

ব্যক্ত করেছেন : '(পুথিতে) চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ অজস্র। চন্দ্রবিন্দু আনুনাসিক উচ্চারণের দ্যোতক এবং আনুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য প্রাকৃত-সম্ভব ভাষাসমূহের অন্যতম বিশেষত্ব' (বসন্তরঞ্জন, ১৩৬৮ : ভূমিকা ১৫)। এই মত কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বিচার্য। কারণ, প্রাকৃতের প্রভাবে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে* এত চন্দ্রবিন্দুর আগমন ঘটে থাকলে *চর্যাপদে* আরও বেশি থাকার কথা। কারণ কালের দিক থেকে সেটির ভাষা তো প্রাকৃতের আরও নিকটবর্তী। কিন্তু *চর্যাপদে* তা ঘটেনি। যেমন –

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে : মোঁ, মোঁই, মোঁএ, মোঁঞ, মোঁঞি, মোঁঞে, আপণেঞিঁ।

চর্যাপদে : মো, মই, মুই, মোএ, আপনে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে চন্দ্রবিন্দুর আধিক্য লক্ষ করে যোগেশচন্দ্র রায় বলেন, পুথিটি উত্তরবঙ্গ ঘুরে বিষ্ণুপুরে এসেছিল। তাঁর মতের পক্ষে বক্তব্য এই, 'রাজবংশী উপভাষায় এইরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়'। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'সাধারণত অসমীয়া ভাষার নাকি নাকি সুর একটা প্রবল লক্ষণ। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* অসমীয়া ভাষার দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছিল। অসমীয়া ভাষায় রচিত *নারায়ণ কবচ* ও *কলঙ্কভঞ্জন* কাব্যের সহিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়' (পার্শ্বনাথ, ১৯৮৫ : ১৫৯)। যোগেশচন্দ্র রায় বোঝাতে চাচ্ছেন, *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* উত্তরবঙ্গ ও আসাম ঘুরে বিষ্ণুপুরে এসেছে। চন্দ্রবিন্দুর উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যার জন্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* পুথিটিকে এত দেশ ভ্রমণ করাবার কোনো দরকার ছিল বলে মনে হয় না। কারণ পার্শ্বনাথ রায় চৌধুরী মনে করেন, বড়ু চণ্ডীদাসের বাসভূমি ও তার সংলগ্ন অঞ্চলসমূহের অর্থাৎ বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ছাতনা, শুশুনিয়া অঞ্চলের ভাষায় আনুনাসিকতা অপেক্ষাকৃত বেশি। ওইসব অঞ্চলের স্থানীয় সাধারণ লোকের ভাষা দেখে মনে করা স্বাভাবিক যে, যতগুলো চন্দ্রবিন্দুবহুল শব্দ কবির কাব্যে প্রযুক্ত হয়েছিল, এর সবগুলোই তৎকালীন স্থানীয় কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হতো। (পার্শ্বনাথ, ১৯৮৫ : ১৫৭, ১৬১)

৫.২ *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* পুথিতে 'অ' স্থানে যত 'আ'-এর ব্যবহার হয়েছে, মধ্যযুগের অন্য কোনো পুথিতে এত আদি 'আ' লক্ষ করা যায় না (মুজাম্মিল, ২০০২ : ৫৬)। এসব শব্দ আঞ্চলিকতার প্রভাবের শিকার হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। (পার্শ্বনাথ, ১৯৮৫ : ১৫৮)

একইসঙ্গে আমাদের এই বিবেচনাও রাখা দরকার, সংস্কৃত বর্ণমালায় 'অ' অক্ষরটি হ্রস্ব আ-এর কাজ করে। এই প্রভাবেও *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে* 'আ'-এর বহুল ব্যবহার হতে পারে। *চর্যাপদের* বানানও 'অ/আ'-এর দ্বিধা থেকে মুক্ত নয়।

৫.৩ যাঁরা মনে করেন বাংলা ভাষা মাগধি প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন, তাঁদের প্রধান যুক্তি হচ্ছে, বাংলার তিন উষ্মধ্বনি শ-ষ-স-এর মধ্যে উচ্চারণে কেবল তালব্য শ

রক্ষিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কথাটি যুক্তিযুক্ত হলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এটি যথার্থ নয়। কারণ মধ্যযুগে দন্ত্য স-এর উচ্চারণ ছিল না – একথা নির্বিচারে স্বীকার্য নয়। মধ্যযুগে প্রবলভাবে উচ্চারণ-অনুগ বানানের চল ছিল। সুতারাং বাংলা পুথিতে দন্ত্য স-এর প্রচুর প্রয়োগ থেকে বোঝা যায়, এর উচ্চারণ নিশ্চয় বজায় ছিল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, 'বাংলার শ-কারত্ব অর্বাচীন বাংলার নিজস্ব ধ্বনিপরিবর্তন।' এর আগে তিনি বলে নিচ্ছেন, 'যেমন পূর্ববঙ্গ ও আসামের উপভাষাতে শ-ষ-স স্থলে 'হ'-কার আরও পরবর্তীকালের ধ্বনিপরিবর্তন।' (শহীদুল্লাহ্, ১৯৬৮ : ৩১, ২৮)

অন্যদিকে দেখা যায়, উড়িয়া ও বিহারিতে দন্ত্য স রক্ষিত এবং বাংলার বাইরে হিন্দি, নেপালি, গুজরাটি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি ভাষাতেও শ-ষ-স স্থানে কেবল দন্ত্য স ব্যবহৃত হয়। শৌরসেনি ও মহারাষ্ট্রি প্রাকৃতেও দন্ত্য স ছিল। উড়িয়া, বিহারি, বাংলা – এইসব সহোদরা ভাষাগুলোর স-কার প্রাচীন প্রাচ্য-প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত। বাংলার তালব্য শ মাগধি প্রাকৃত থেকে এলে বাংলার সহোদরা ভাষাগুলোতেও তালব্য শ হতো। তা হয়নি বলেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলার তালব্য শ-কে 'অবাচীন বাংলার নিজস্ব ধ্বনিপরিবর্তন' বলে মন্তব্য করেছেন। মুজাম্মিল হক বলছেন, ধ্বনিপরিবর্তন ধীরে ধীরে সাধিত হয় বলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঙ্গত যে, আধুনিক বাংলার শ-কারত্ব মধ্যযুগের শেষ থেকে অল্পবিস্তর শুরু হয়েছিল। তাই ওই সময়ের বাংলায় দন্ত্য স-এর পাশাপাশি তালব্য শ-ও স্থান করে নিয়েছিল এবং লিপিকরের হাতে সংস্কৃতের শ-ষ-স-এর যথেচ্ছ প্রয়োগ ঘটেছিল; যদিও উচ্চারণে দন্ত্য স-এর প্রাধান্য ছিল। (মুজাম্মিল, ২০০২ : ৬০)

বস্তুত মাগধি প্রাকৃত বা প্রাচ্য-প্রাকৃত, নামান্তরে গৌড়ি প্রাকৃত বা শৌরসেনি প্রাকৃত বা মহারাষ্ট্রি প্রাকৃত, যে-উৎস থেকেই আসুক না কেন বাংলায় দন্ত্য স ও তালব্য শ দুটিই তার অধিকার বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। দন্ত্য স প্রাচীন বাংলায়, তালব্য শ 'অর্বাচীন' বাংলায় উচ্চারণগত মূল্য পেয়েছে।

৫.৪ মধ্যযুগের বাংলা পুথিতে দন্ত্য ন ও মূর্ধন্য ণ-এর যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা যায়। এ দুটি বর্ণের উচ্চারণে কোনো পার্থক্য ছিল বলে মনে হয় না। তাছাড়া বানান পার্থক্যের কারণে পাঠক বা শ্রোতার পক্ষে অর্থ অনুধাবনেও অসুবিধা হতো না।[৪] *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* পুথিতে দন্ত্য ন এবং মূর্ধন্য ণ-এর লিপিগত ভিন্নতা লক্ষ করা গেলেও এর প্রয়োগ খুব বেশি অনিয়মিত নয়। অর্থাৎ শব্দের বানানে মোটামুটি যথাযথভাবে দন্ত্য ন ও মূর্ধন্য ণ-এর প্রয়োগ ঘটেছে। একজন গবেষক জানাচ্ছেন, পরবর্তী সময়ের পুথিসমূহে মূর্ধণ্য ণ-এর স্বতন্ত্র রূপ সহজে দেখা যায় না। ফলে বানানে দন্ত্য ন ও মূর্ধণ্য ণ-এর কোনো স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় না। (মুজাম্মিল, ২০০০ : ১১২)

৫.৫ মধ্যযুগের বাংলা পুথিতে দীর্ঘ ঈ-এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। *চর্যাপদে*ও দীর্ঘ ঈ ব্যবহৃত হয়নি। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে* হ্রস্ব ই ও দীর্ঘ ঈ – দুইয়েরই ব্যবহার আছে। আবার একই শব্দের জন্য দুরকম বানানও দেখা যায় [যেমন : ইশর/ঈশর (ঈশ্বর)]। পরবর্তীকালের পুথিতে দীর্ঘ ঈ-এর ব্যবহার একান্ত বিরল।[৫]

৫.৬ *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* পুথিতে হ্রস্ব উ ও দীর্ঘ ঊ-এর বিকল্প প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন, উপায়/উপায়, উপহাসে/উপহাসে, উপসন্ন/উপসন্ন, উপরে/উপরে, উপজিল/ উপজিল। এ থেকে বোঝা যায়, এ দুই বর্ণের উচ্চারণের প্রভেদ লুপ্ত হয়েছে।[৬] হ্রাস্ব উ এবং দীর্ঘ ঊ-এর উচ্চারণে কোনো ভেদ নেই এবং অর্থ নির্ণয়ে দুইয়ের স্বতন্ত্র ভূমিকা নেই। মধ্যযুগের শেষদিকের পুথিসমূহেও উ-কার (ু)-এর ভূমিকা সমধিক। ঊ-কার (ূ) ক্বচিৎ চোখে পড়ে; তাও অপ্রয়োজনে, অস্থানে এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

মধ্যযুগের লিপিপদ্ধতিতে ব-ফলা দিয়ে উ-কার বোঝানো হতো। যেমন, দ্বখ (দুখ), স্বন (সুন), ত্বরিত (তুরিত), দ্বর্গতি (দুর্গতি)। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে*র লিপিতে ব-ফলা দিয়ে উ-কার চিহ্নিত হয়নি। এই লক্ষণটি পুথির আধুনিকতার পরিচয়বহ।

৫.৭ *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে*র পুথিতে বর্গীয় জ এবং অন্তস্থ য-এর প্রায় যথেচ্ছ ব্যবহার ঘটেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যরচয়িতাদের বানানরীতি বা বানান-আদর্শ কী ছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। তবে লিপিকরদের বানারীতির বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃত অপভ্রংশের বানানরীতির ঐতিহ্য, উচ্চারণ-অনুগ বানান লেখার প্রবণতা – এসবের আলোকে মধ্যযুগের পুথির কোনো বানান-আদর্শ ছিল কি-না, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করা যায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের যে-কোনো বাংলা পুথি পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তাতে অন্তস্থ য-এর জায়গায় বর্গীয় জ সমধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। উচ্চারণ-অনুগ বানান লেখার প্রবণতা থেকেই এমনটি হয়েছে। সংস্কৃত অন্তস্থ য-এর উচ্চারণ ছিল 'ইয়'। কিন্তু বাঙালি 'ইয়' (য)-কে সোজাসুজি 'জ' রূপে উচ্চারণ করে স্বস্তি পেয়েছে। তাই মধ্যযুগের পুথিতে বর্গীয় জ-এর ব্যবহার অন্তস্থ য-এর চেয়ে বেশি।

এছাড়া সংস্কৃত শব্দের আদি বা অনাদি য, দ্য, জ্য, জ্ব, র্য্য প্রাকৃতে বা মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তরে 'জ' বা 'জ্জ'-তে রূপান্তরিত হত (Chatterjee, 2011: 474)। যেমন : অদ্য > আজ, সূর্য্য > সুরুজ, কার্য > কাজ। প্রাকৃতের এই নিয়ম উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলায় গৃহীত হয়েছিল।

আধুনিক বাংলা বানানে অন্তস্থ য-এর পুনরাগমনের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সংস্কৃতবিলাসী পণ্ডিতগণের অভিজাত বাংলা নির্মাণের প্রয়োসের মধ্যে। সংস্কৃত শব্দের মূল বানানের 'য'-কে অতৎসম শব্দেও তারা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। (Chatterjee, 2011: 134)

৫.৮ মধ্যযুগের পুথিতে 'ক্ষ' ধ্বনিকে মূল 'ক্ষ' রূপে গণ্য না করে 'ক্খ' বা 'খ্খ' রূপে বিবেচনা করা হত। শব্দের আদিতে এর একক রূপ 'খ' ব্যবহারেই লিপিকরদের অভিপ্রায় ছিল (যেমন : 'ক্ষণে' শব্দের লিপিরূপ 'খনে')। কিন্তু শব্দের আদিতে কখনও কখনও 'ক্ষ' অক্ষরও তাঁরা ব্যবহার করেছেন (যেমন : ক্ষণে, ক্ষেমা)। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শব্দের আদিতে 'ক্ষ' স্থলে 'খ'-এর প্রয়োগই সমধিক। তাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্ষ রক্ষিত। আমরা ৪.৮ অংশের বর্ণনায় দেখেছি, কিছু পরিবর্তিত তৎসম শব্দে ক্ষ স্থলে খ-এর চমৎকার রূপান্তরিত ব্যবহার।

৫.৯ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের শেষে আঁ যুক্ত হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু শব্দেও আঁ-এর ব্যবহার দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলাভাষা-পরিচয়ে লিখেছেন, 'আমার বিশ্বাস এটা রাঢ় দেশের লেখক ও লিপিকরদের অভ্যস্ত ব্যবহার। আনুনাসিক বর্জনের জন্যেই পূর্ববঙ্গ বিখ্যাত।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২ : ৬০৬)

৬. উপসংহার

সুকুমার সেন *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বলে উল্লেখ করেছিলেন এর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বিচার করে। অধিকাংশ পণ্ডিত পুথির লিপিকালকে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে প্রমাণ দেখিয়েছেন বা মেনে নিয়েছেন। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের* বানানরীতি (এবং প্রায় ক্ষেত্রে লিপি-আকৃতি) দেখে মনে হয়, এর লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী হওয়া অসম্ভব নয়। মূল *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* চৈতন্য দেব (১৪৮৬–১৫৩৩খ্রি.)-এর পূর্ববর্তী হওয়াই সঙ্গত; কিন্তু বসন্তরঞ্জন রায়ের আবিষ্কৃত পুথির অনুলিপিকাল আধুনিক যুগের খুব দূরবর্তী নয়। আর কিছু বর্ণের প্রাচীন আকার কিংবা একই বর্ণের বর্তমান ও প্রাচীন আকার দেখে মনে হয়, অনুলিপি তৈরির সময় লিপিকরের সতর্কতার অভাবে এমনটি ঘটে থাকতে পারে। কেননা, পুথিটি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী হলে এর লিপি ও বানানে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রভাব থাকা সম্ভব নয়।

টীকা

১ পুথির প্রথম দুটি এবং শেষের অন্তত একটি পাতা পাওয়া যায়নি; মধ্যেও কয়েকটি পাতা নষ্ট হয়েছে অথবা হারিয়ে গেছে। অতএব স্বাভাবিকভাবেই বড়ু চণ্ডীদাসের এ গ্রন্থের নাম কী ছিল জানা যায় না। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামটি সম্পাদক-প্রদত্ত। নামকরণ সম্পর্কে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বসন্তরঞ্জন রায় লেখেন, 'দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাস বিরচিত কৃষ্ণকীর্ত্তন-এর অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এতোদিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা আলোচ্য পুঁথিই *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* এবং সেইহেতু উহার অনুকরণ নাম নির্দেশ করা হইল'। (হাই ও পাশা, ১৪০২ : ৫)

২ 'পুরানো বাঙ্গালা কেমন ছিল, জানিতে হইলে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সাহায্য লইতে হইবে। মুদ্রিত পুস্তকে প্রাচীন রূপ পাইবার আশা দুরাশা। কেন না, এ পর্য্যন্ত যত প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ বড় জোর ২৫০ বৎসরের; ৩০০ বর্ষের আদর্শ দেখিয়া মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম। সম্পাদকের রুচি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে প্রায়শ ঐ সকল পুস্তকের পাঠ বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত। সাধারণ পাঠকের সুখ-বোধ্য করিবার অভিপ্রায়েও প্রাচীন গ্রন্থগুলি অধুনা প্রচলিত ভাষায় শোধিত

হইয়া প্রকাশিত হয়। পুথিতেও শোধনের প্রয়াস দেখা যায়। কোন এক পুথির দুইখানি প্রতিলিপিতে কৃচিৎ মিল হয়। হস্তলিখিত সুপ্রাচীন পুথি একান্ত দুর্ল্লভ। কবির স্বহস্তলিখিত পুথির ত কথাই নাই।' (বসন্তরঞ্জন, ১৩৬৮; ভূমিকা ১২)

৩ 'বাঙলা পুঁথির বানান-সমস্যা' প্রবন্ধে উদাহরণ সহযোগে প্রাবন্ধিক মধ্যযুগের বানানের কিছু প্রবণতা তুলে ধরেছেন। (মুজাম্মিল, ২০০২ : ৬২-৬৪)

৪ যদিও সংস্কৃত 'ণ'-এর উচ্চারণ ছিল ড়ঁ-এর মতো, কিন্তু মধ্যযুগের বাঙালির উচ্চারণে বর্ণটি দন্ত্য ন-এর উচ্চারণ লাভ করেছিল। তাই পুথির বানানে দন্ত্য ন এবং মূর্ধন্য ণ ভেদাভেদ লুপ্ত হয়েছিল।

৫ মধ্যযুগের পুথি আসর করে পড়া হতো বলে এর বানানের দিকটি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। ফলে, পুথির বর্ণায়নে ই-কার (ি) বা ঈ-কার (ী) নিয়ে শ্রোতার কোনো সমস্যা ছিল না। প্রাণী-প্রাণি, জীবন-জিবন, ঈগল-ইগল, ঈশ্বর-ইশ্বর, পৃথিবী-প্রিথিবি – যেটিই পড়া হোক না কেন, শোনামাত্র এর অর্থ অনুধাবনে শ্রোতার সমস্যা হয় না। তাই লিপিতে ই-কার ও ঈ-কারের প্রভেদ লুপ্ত হয়েছিল। এমনকি, এই কারণে লেখার সময়েও লিপিকরগণ বানান-সাম্য রক্ষার ব্যাপারে অসচেতন ছিলেন।

৬ মধ্যযুগের বাংলা পুথিতে হ্রস্ব উ এবং দীর্ঘ ঊ-এর স্বতন্ত্র রূপ বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। *চর্যাপদে* দীর্ঘ ঊ-এর ব্যবহার নেই। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঊ-কারের (ূ) প্রয়োগ আছে। যেমন : অবধূতী, অবধূই, মূঢ়, মূল।

গ্রন্থপঞ্জি

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল। (২০০০)। *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা*, ঢাকা : গতিধারা।

নীলতরন সেন [সম্পা.]। (২০০৪)। *বড়-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : সাহিত্যেলোক।

পার্শ্বনাথ রায় চৌধুরী। (১৯৮৫)। *বড়-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুনর্মূল্যায়ন*, কলকাতা : করুণা।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ [সম্পা.]। (১৩৬৮ সপ্তম সংস্করণ)। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

মুজাম্মিল হক, খন্দকার । (২০০০)। *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সম্পাদনা*, ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা।

মুজাম্মিল হক, খন্দকার। (২০০২)। *বাঙলা পুঁথির বানান সমস্যা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা : সময় প্রকাশন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (২০০২)। 'বাংলাভাষা-পরিচয়', *রবীন্দ্রসমগ্র* খণ্ড ১৩, ঢাকা : পাঠক সমাবেশ।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৩৬৮)। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল', *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* [সম্পা. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ], কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, সপ্তম সংস্করণ।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। (১৩৬৮ সপ্তম সংস্করণ)। 'মুখবন্ধ', *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* [সম্পা. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ], কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ। (১৯৬৮)। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

হাই, মুহম্মদ আবদুল ও পাশা, আনোয়ার [সম্পা.]। (১৪০২ পঞ্চম সংস্করণ)। *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*, ঢাকা : ষ্টুডেন্ট ওয়েজ।

Chatterji, Suniti Kumar. (2011 Fourth Impression). *The Origin and Development of the Bengali Language*, New Delhi: Rupa Publications.